স্বপ্ন দেখি জেগে।

দিগন্ত বড়ুয়া

...তারপর ধীরে ধীরে আমি বললাম তোমরা কি সহায় সম্বলহীন নাকি আমার উপর নির্ভরশীল ? যে দেশে দিগন্ত নাই সেই দেশ কি চলে না ? যে দেশে দিগন্ত মরে যায় সেই দেশে দিগন্তদের পরিবার কি অসহায় হয়ে পরে ?...

...বর্ষীয়ান আফজালকে আমি দাদু ডাকি। উনি বলে উঠলেন দাদু জানো মুক্তমনা নামে যে ওয়েব সাইট টা আছে, তা কিন্ত বেশ ভালো করছে। বেশ ভালো ভালো কিছু লেখা আছে তাদের। আমার তো কাজ কাম নাই তাই বসে বসে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বাংলা সাইট গুলো দেখি। আমি গায়ে পরে জিজ্ঞাসা করলাম আপনী ভিন্নমত দেখেন না ? তিনি বললেন দেখি। কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করায় একটু কি যেন ভেবে বললেন ভিন্নমত কি বেশী দিন চালাতে পারবে ?...

...হঠাৎ দাদুর একটা কথা মনে দাগ কাটলো, তিনি বললেন, আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি একটি মৌলবাদী মুসলিমকেও বুঝাতে পারি, সচেতন করতে পারি সব মানুষ সমান, একই দেখতে, একই সুখ দুঃখের জীবন, আর সেই বুঝানোতে যদি একটি মৌলবাদী ও সৎ পথে আনতে পারি সে হবে আমাদের বড় পাওয়া।...

সম্রাট অশোকের জীবনী পড়ছেন আমার বাবা। আমি গিয়ে বললাম কি পড়ছেন, বাবা আমাকে বললেন অশোকের জীবনী। আমি বললাম কোন অশোক ? তুই কোন কোন আশোককে জানিস আমি জানি না, আমি অশোক বলতে সম্রাট অশোককেই জানি। একটু পরে বাবা বললেন পৃথিবীতে দুই জন অশোকের জীবনী লেখা হয়েছে নাকি ? আমি শুরু করে দিলাম নানা পেঁচ্যাল। এটা সেটা অনেক কথা বলছি। নানা বিষয়ে কথা তুলছি, কথার এক পর্যায়ে বাবা আমাকে বললেন তুই একটা অ-জ্ঞানী। তোর এই বুড়া বয়সেও কোনো জ্ঞান হলো না। আমি বললাম বাবাকে, আপনার এত্ত বড় সাহস, আপনী আমাকে অ-জ্ঞানী বলতে পারেন !!! ইন্টারনেটে/ভিন্নমতে গিয়ে দেখুন, আমাকে আলমগীর নামক এক লেখক মহা জ্ঞানী বলে সম্বোধন করে লিখেছে। তার পর বাবার মুচকি হাসি দেখে বললাম প্রমান দিতে পারি নেটে। যেই ফিরতে পা বাড়ালাম, বাবা বললেন তোর সব লেখা আমি পড়েছি, শুনে মাত্র গা কেঁপে উঠলো, ভাবলাম আরে, আমি তো বাড়ীর কেউকে বলি নাই। কেউ কেউ সন্ধেহ করে বাড়ীতে, আজকাল আমি লিখি, দেড় যুগ ধরে বাংলা লিখিনা বলে হয়তো বাংলা লেখার একটু ইচ্ছা হয়। পাশা পাশি আমার ও আমাদের কথা গুলো সাধারণ মানুষকে বলতে ইচ্ছা হয়। তাই লিখতে বসে যাওয়া। রাতে খাবার সময় বাবা বললো আমি দেখলাম তোমাকে যে মহাজ্ঞানী করে লিখেছে সে কি বলতে চেয়েছে। তবে তোমার লেখায় বানান ভুল আছে। আমার মুখে কোনো কথা নাই, খেয়াল করছি বাবা ও মা কিছু বলে কিনা। নাহ ! কারো কোনো কথা নাই। বুঝতে পারলাম কোনো বিষয় বা কিছুকেই অথবা কাউকেই পাত্তা দিচ্ছেন না এই বুড়ো

দম্পতি। তখন মনে মনে বলছি, বাবা আপনিতো বিদেশে এক যুগও পার করেন নি, তাই আমার লেখায় ভুল কি করে হয় বুঝবেন কি করে? তবুও নিজের দুর্বলতাকে চাপা দিতে বললাম, কাজে কর্মে পুর্ব এশিয়ার বেশ কটি দেশে থাকতে হয়েছে কয়েক বছর, এখন এই দেশে। তো আমি যা দেখলাম, দেখছি, পয্যায় ক্রমে এক একটি অঞ্চল ভাষা মানুষ এতে করে মনের অজান্তে এখনো অনেক কিছু গুলিয়েই ফেলি মাঝে মাঝে। বাবা বললেন, মানুষ দেখে শুনে শিখে, আর তুমি দেখে শুনে খিচুড়ি হচ্ছো। উল্লেখ্য বাবা আমার ভালো বন্ধু। বাবার যৌবন কালের, বিয়ের আগের সব ঘটনাই আমাকে বলেছেন কম বেশী, যা আমাকে বলার মতো। তা নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বাবার সাথে দুষ্টামী করি। ভাই ছোটটা হঠাৎ বলে উঠলো আমি ও দেখেছি। কি দেখেছিস, বাবা বললেন, সে বললো বড়দার লেখার বিরুদ্ধে,তখন আমি চুপ। খাচ্ছি তো খাচ্ছি। হঠাৎ কে জানি ফোন করলো। আমার সুস্মিতাটা গিয়ে ফোন ধরলো। কার সাথে জানি কথা বলছে, একটু কান খাড়া করে শুনছি, ভাই আর বলবেন না, আপনার বন্ধুরে বলেন সংশারে যেনো মন দেয়, ছেলে পেলেদের যেন একটু সময় দেয়, বুড়া বয়সে ভীম রতির মতো করছে, আজকাল আমাকে কোনো সময়ই দেয় না। ফোন রাখারা পরে জিজ্ঞাসা করলাম তুমি খেয়েছো, আর যাই কোথায়, ভিমরুলের চাকে ঢিল ছোড়ার মতো লাগলো আমার পেছনে কতক্ষন। এই ফাঁকে মা ও সুযোগ নিল। সাংশারিক অনেক কথার ফাঁকে আমার সেই সুস্মিতাও বলে উঠলো, নেটে লিখো ভালো কথা। নিজেদের মানুষের কথা লিখো ভালো কথা, উগ্র মানুষকে সরাসরি আঘাত করো কেনো ? আমি বললাম তাতে কি হয়েছে? আমিতো বাস্তব কথাটাই বলতে চাচ্ছি। মা ও সুস্মিতা বললো কোনো ভাবে যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে কেউ ? আমরা যাব কোথায় ? আমি আবারও সুস্মিতাকে বললাম খেয়েছ ? সে বলল অফিস থেকে এসে একবারে খেয়ে নিয়েছি। তারপর ধীরে ধীরে আমি বললাম তোমরা কি সহায় সম্বলহীন নাকি আমার উপর নির্ভরশীল ? যে দেশে দিগন্ত নাই সেই দেশ কি চলে না । যে দেশে দিগন্ত মরে যায় সেই দেশে দিগন্তদের পরিবার কি অসহায় হয়ে পরে ? রনে ভঙ্গ দিয়ে মা ও সে চলে গেলো। তখন আমি ভাবছি আমি আসলে কি করছি। ভেবে ঠিক করলাম কালকে আমি এক লোকের সাথে কথা বলবো। সব কিছু খোলা মেলা আলোচনা করবো। আমার সেই লোক শ্রদ্ধেয় রায়দা। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু। বাংলাদেশের ও ভারতের কোনো প্রধান বিদ্যাপীঠে গুরুর কাজ করেছেন। তারপর থেকে পৃথিবী ঘুরে ঘুরে অনেক শিক্ষালয়ে কাজ করে তার ফাঁকে একবার সম্মানের সহিত ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন, এখন এই দেশে মাস্টার মশাইয়ের কাজ করছেন। এখানেও এই অঞ্চলের একটা দ্বিতিয় প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগুরুর কাজ করেন। চির কুমার এই মাস্টার মশাইকে আমি যত দিন ধরে জানি , কোনো দিন মানুষের অ-কল্যানের কথা বলতে শুনিনি। উনার কাছে যাবার কথা ভাবতেই মনে হলো উনার মামার তো অসুখ, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পার করে মামাকে এই দেশে আনিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তাই কি করা যায় ভেবে ভেবে রাতটা কাটালাম । সকালে ফোন করমাল। বললাম একটু কথা আছে, তিনি এক অট্ট হাসি দিয়ে বললেন আমি জানি। আমি কালকে জানলাম তুমি নতুন কাজে হাত দিচ্ছ। আমি বললাম না। আমি অন্য বিষয়ে কথা বলতে চাই। কথা মতো বিকেলে দেখা হলো। উনার আবাসে গিয়ে দেখি, ডঃ নমিতা, ডঃ রহমান সহ আরো কয়েকজন বসে কথা বলছেন। বাকীদেরকে আমি মুখ চেনা চিনলেও নাম জানি না। রায়দা পরিচয় করিয়ে দিলেন সবার সাথে। দেখা হতেই ডঃ রহমান বলল জানো দিগন্ত তোমার নামে নাম, কে একজন নেটে লিখছে। তাকে বেশ কিছু মানুষ বিভিন্ন ভাবে বিরুদ্ধাচরন করে লিখছে, জানোনা! নেটে যা হয় আরকি!! আমি সুযোগ পেয়ে বললাম যাক আমার নামে আরো মানুষ আছে তা হলে। তখন ভাবছি, শেষ পর্যন্ত কি ধরা খাবো? আমি তো কেউকে বলিনা, আমি যে একটু লিখতে চেস্টা করি। তবুও মনে একটু সাহস পেলাম। মুখের কথা আর লেখার মধ্যে অনেক তফাৎ। তারপর রায় দা বললেন তোমার কি খবর বলো। আমি বললাম অনেক দিন দেখা হয় না, তাই একটু দেখা করতে আসলাম। তিনি বললেন তাতে কি, ফোনেতো কথা হয়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলার সময় আরো দুইজন এসে হাজির। সব মিলিয়ে আমরা আট জনের মতো হলাম। বিকাল বেলা। একটু পরে সন্ধ্যা হবে। জন্মগত

ভাবে বাঙ্গালী আড্ডা না দিলে কি হয় ! কেউ কফি কেউ চা খেতে খেতে নানা বিষয়ে কথা বলতে বলতে আবারো সবাই নেটের কথায় চলে গেলেন। এখানে আমরা আট জনের মধ্যে আমি ছাড়া বাকী সবাই বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়েব সাইটের বিভিন্ন কথা তুলতে গিয়ে আবারো ভিন্নমতের কথায় চলে এলো সবাই। বর্ষীয়ান আফজালকে আমি দাদু ডাকি। উনি বলে উঠলেন দাদু জানো মুক্তমনা নামে যে ওয়েব সাইট টা আছে, তা কিন্ত বেশ ভালো করছে। বেশ ভালো ভালো কিছু লেখা আছে তাদের। আমার তো কাজ কাম নাই তাই বসে বসে ইন্টারনেটে বিভিন্ন বাংলা সাইট গুলো দেখি। আমি গায়ে পরে জিজ্ঞাসা করলাম আপনী ভিন্নমত দেখেন না ? তিনি বললেন দেখি। কেমন লাগে জিজ্ঞাসা করায় একটু কি যেন ভেবে বললেন ভিন্নমত কি বেশী দিন চালাতে পারবে ? কাগজ ওয়ালাকে শক্ত ভাবে আপন ভিত্তির উপর দাড়িয়ে থাকতে হবে কাগজটা রক্ষা করতে। আমি বললাম কেনো ? নেটে যার পয়সা আছে সে একটা কাগজ করতে পারে, আপনি আমি সবাই। উনি বললেন করলেতো হলো না, কম্পিউটার একটু গুতোতে জানলে কি আর সব কাজ পারে? আমি বললাম ঠিকই বলেছেন আপনী। তারপর আমি বললাম এখন আপনারা কি ভাবছেন বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়ে ? কথার ফাঁকে রহমান বলে উঠল আমরা থাকি বিদেশে। আমরা কি করতে পারি ? আফজাল দাদু বলে উঠলেন আমরা চাইলে কিছুই করতে পারিনা , তবে এত টুকু পারি অন্তত সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারি। রায়দা বললেন কি ভাবে, দেশে নিজেদের এলাকার আশে পাশে সামান্য প্রচেস্টা চালাতে পারি, যাহা মানুষ মানে কোনো ধর্ম নয়, মানুষ মানে সামাজীক জীব। দাদু আরো বললেন একটু লিখে একটু পরিচিত মানুষের সাথে আলোচনা করে, বিভিন্ন সভা সমিতির মাঝে আলোচনার বিষয় রেখে আলাপ করতে পারি। এই কথা মুখে না বলে কাজে চেস্টা চালিয়ে দেখতে পারি। এই ফাঁকে ডঃ রহমান আমাকে বলল, তুমি নেটে কোনো কাগজ পড় না ? আমি বললাম পড়ি মাঝে মাঝে। তা হলে তোমার নামে লেখকের লেখা নিশ্চয় পড়েছ। আমি বললাম পড়েছি। তোমার কি মন্তব্য ? আমি বললাম আমার মতো কাজ পাগল মানুষের কি আর মতামত থাকতে পারে ? তারপর রহমান বলল লেখকের প্রথম কয়েক পর্বে লেখা দেখেছি যে তিনি বলেছেন বাংলাদেশে দাড়িয়ে বাংলাদেশের কথা বলছেন। এতে তিনি বিভিন্ন দেশের রেফারেনর্স টানতে পারেন, কিন্ত তার মুল উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সংখ্যলঘু সমস্যা বিষয়ে কথা বলা। ডঃ নমিতা অনেকক্ষন চুপ থেকে বলে উঠলেন আমি জানতামও না যে ভিন্নমত বা মুক্তমনা নামে কোনো ওয়েব সাইট আছে। কিছুদিন আগে কি যেন খুজতে গিয়ে দেখতে পাই। হিসাব মিলেনা : আমি ছয় পর্ব পয্যন্ত পড়েছি। একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম লেখক নিজে বা পারিপাস্বিক ভাবে বেশ অত্যাচারিত বাংলাদেশের সংখ্যগুরু জনগণ দ্বারা। এত গুলো গুনী জনের কথার মাঝখানে কথা ঢুকিয়ে দিয়ে বললাম , লেখক নির্য্যাতিত ভালো কথা, কোনো এক জাতী গুষ্ঠীকে এই ভাবে স্বম্বোধন করবে তা কি হয় ? আর তা ছাড়া আর একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করলাম লেখকের লেখার বিরোধীতা করতে গেলে কেউ বাংলাদেশের স্তম্ভে দাড়িয়ে কিছু বলতে না পেরে গুজরাট, ফিলিস্তানে চলে যায় তথ্য আনতে। এটা কোন ডিজাইনের বিরোধীতা বা প্রতিউত্তর বুঝলাম না। ডিজাইন শব্দটা বলায় কেউ কেউ হেসে উঠলো। এমন সময় দাদু কিছু বলতে যাবেন তখন নমিতা বললো আমার কথাটা আগে শেষ করি। এমন সময় চল্লিশোর্ধ সুন্দরী নমিতার স্বামী পিটার বলে উঠলেন, যিনি এতক্ষন আমাদের কথা শুনেছেন কিন্ত হ্যাঁ না করেগেছেন, তিনি বললেন আমার জন্ম রাজশাহী শহরে। আমার বাড়ী থেকে প্রায় দুই/তিন ঘন্টার পথ। আমরা সবাই শহরে থাকতাম বিধায় আমাদের বাড়ী ঘর খুব সামান্য জায়গা জমি দেখা শোনা করতেন আমাদেরই এলাকার হাশেম মাতবরের ছেলে। বিনিময়ে আমাদের জমির ধান গুলো খেতো আর আমরা ভাবতাম জায়গা গুলো নিরাপদ আছে। কিছু বছর আগে আমার বড় ভাই (আইন পেশার সাতে জরিত) নিজে গ্রামে কিছু একটা করতে গিয়ে দেখে এখন আর কাগজে পত্রে আমাদের কিছুই নাই। অপর দিকে আমার বাবা ও নাই। এমন সময় ও আমাদের এলাকার সবাই জানে এখনো এই গুলো আমাদের সম্পত্তি। কয়েক মাস পরে যখন সবাই জেনে গেলো যে হাশেম মাতবরের ছেলে আমাদের সব কিছু আত্নসাত করেছে। সেই থেকে আমরা আর কেউ গ্রামে যাই নাই । এখনো দেশে

গেলে গ্রামে যাই না। দুঃখ লাগে, বাপ দাদার ভিটায় একটা চেরাগ ও জ্বালাতে পারিনা। এই লেখা দিগন্ত নামক লেখক না লিখে আমি লিখলে আমি ও হয়তো এর চেয়ে খারাপ কিছু বলতে পারতাম , কারণ আমি ভুক্তভোগী। আমাদের গণ দাদু কতক্ষন পিটারের দিকে চেয়ে থেকে বললেন আপনী কোনো দিন তো কাউকে বলেন নি। পিটার বললো মনে আগুন কতক্ষন চাপা দিয়ে রাখা যায় দাদু ? রায়দা তখন মুচকি মুচকি হাসছেন আমার দিকে তাকিয়ে। রহমান বলল ভালোয় খারাপেইতো মানুষ, সব মুসলিম কি খারাপ ? কথা আবার আমি টেনে নিলাম। আমি বললাম রহমান দেখ, আমি লেখকের লেখায় দেখেছি, তিনি সব সময় ভালো কিছু মানুষকে বাদ দিয়ে কথা বলেছেন। দাদু বললেন, আমাদের বাংলাদেশের মুসলিম সমাজটা এক্কেবারে গেছে, অত্যাচারের চরম সীমার কাল ধরে এগিয়ে চলছে। এই বার রায়দা কথা শুরু করলেন, এই অন্ধকার জগৎ থেকে বের করে আনার দায়িত্ব আপনাদের কিছু ভালো মানুষের কাজ। আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন না। কেন যে আপনারা চুপ থাকেন কোনো প্রসঙ্গ পেয়েও তাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহীত করেন বুঝতে পারিনা, এটা কি আপনাদের অভ্যাস নাকি নিজেদেরকে লুকানোর জন্য করেন জানি না।এই সময় আমাদের আড্ডায় যোগ দিলেন রায়দার বুড়ো মামা। তিনি বললেন আমি তো আসলাম মাত্র কয়দিন আগে দেশ থেকে। আমি যা বলবো তা আরো করুন জঘন্য বীভৎস হবে, তাই আমার কিছু না বলাই ভালো হবে। রায় দার মামা ছিলেন সমাজ কল্যান বিষয়ক কোনো সরকারী কর্মকর্তা। এখন অবসরে। গণ মামা বললেন (গণ দাদু ও গণ মামা বলার কারণ হলো এই দুইজন মানুষকে সবাই দাদু ও মামা বলে কারণ দাদুকে দাদু ডাকে সবাই আমাদের এই এলাকায় বর্ষীয়ান হওয়ায়। আর মামাকে রায় দাকে দাদা বলে সেই সুত্রে মামা বলে সবাই এখন) সরকারের কাজ করতে গিয়ে জীবনে কতযে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি তা কি আর একদিনে বলে শেষ করা যাবে ? তবুও বলি চাকরিতে হিন্দু ছিলাম বলে অনেক বার আমার প্রমোশান আটকে গিয়েছিল। উচ্চ পদস্ত এমনকি অধস্তন কর্মী থেকে ও মাঝে মাঝে বিরুপ আচরনের কারণে পরে আর কোনোদিন মনযোগ দিয়ে কাজ করতে পারিনাই। ঘৃনা কি আমার ও কম বাংলাদেশ সরকার ও মুসলিমদের উপর ? এবার আমি চুপ, সবাই কথা বলছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। প্রসঙ্গ দিগন্তের লেখা। হঠাৎ দাদুর একটা কথা মনে দাগ কাটলো, তিনি বললেন, আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি একটি মৌলবাদী মুসলিমকেও বুঝাতে পারি, সচেতন করতে পারি সব মানুষ সমান, একই দেখতে, একই সুখ দুঃখের জীবন, আর সেই বুঝানোতে যদি একটি মৌলবাদী ও সৎ পথে আনতে পারি সে হবে আমাদের বড় পাওয়া। এবার আমি দাদুকে অনেকটা পেয়েছি মতো করে ধরলাম, দাদু দেখেন, যে লেখাটার কথা আমরা এতক্ষন আলোচনা করছি তার একটা বিষয় খেয়াল করেছেন কি ? দাদু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে , এমন সময় আর যে কয় জন মৌন ছিল তাদের একজন শিশির বলে উঠলেন চলুন দাদু অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি। অন্য জন তারই স্ত্রী বললেন না, কথাটা শেষ হোক। তখন দাদু বলতে শুরু করলেন, মৌলবাদীর উন্মাদনায় ডুবে আছে বাংগালী মুসলিম। তাদের সাধারণ জীবনে ফিরিয়ে আনা এত্ত সহজ নয়। তবুও আমি আমার কথা বলতে দাদুকে বললাম থামুন, আমার কথাটা শেষ করতে দিন। বলতে শুরু করলাম , এই পর্যন্ত যে কয়জন লিখেছেন দিগন্তের লেখার বিপরীতে তারা শুধু এছালামী গুনগানকে সম্বল করে , তুলনা করে গুজরাটে ফিলিস্তানে কি হলো তা নিয়ে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের তারা কি করছে তা কেন বলে না ? উত্তরে দাদুকে ছাড়িয়ে রহমান বলে উঠলো, উন্মাদনার কাছে মানবতার কোনো দাম নাই। তাই এই লেখককে যে ভাবেই পারে ঘায়েল করতে চাইবেই। এই রহমানই বলে উঠল আর একটা কথা বলি, খেয়াল করেছ কি , নেটে এত্ত লেখক তাদের মধ্যে কাউকে পেয়েছ দিগন্তের লেখার প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে একটি কথা ও বলতে? তবে কয়েক জন যে লিখেনি তা নয়। তা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। আমি বললাম কেউ হয়তো প্রয়োজন মনে করেনি, বা কেউ তা ভাবে নি, কেউ হয়তো একটু দুঃখ প্রকাশ করেছে তবুও শত বিরুদ্ধাচারীর মাঝে যারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সহমর্মিতা প্রকাশ করে লিখেছেন তাদেরকে আমাদের ধন্যবাদ দেয়া উচিৎ ।,একেবারে কেউ যদি সহমর্মিতা নাও দেখাতো, তাই বলে কি দিগন্তেরা কি থেমে থাকতো ? এবার দাদু বলে উঠলেন,

কথাটা ঠিক বলা হলো না, কেউ কেউ দিগন্তদের দুঃখে সামান্য মর্ম বেদনার কথা বলেছে তবে আমারও শেষ লাইনে বলতে হয়, কারো কাছ থেকে একটু ও প্রয়োজনীয় কোনো কথা পাইনি। মুসলিম লেখককদের উচিৎ ছিল নিজেদের মানুষের সচেতনতার কথা লিখে দিগন্তের প্রতি মানবতা প্রকাশ করার। লেখকের বিরোধীতাকারী দেখলাম অনেক। হঠাৎ কে আসলো, রায়দা দরজা খুলতে গিয়ে দেখলেন , আমারই সুস্মিতা আমাকে খুজে খুজে হয়রান। এই পরবাসেও আমাকে এখন চোখে চোখে রাখে আমার পরিবারের সবাই। কেন ??? ভয়ে। কারণ, যার বাপকে কুমিরে খেয়েছে সে ঢেঁকি দেখলে ভয় পায়। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভাই এসে হাজির। সে বলে বাবা ডাকে, এখুনি বাড়ী যেতে হবে। (উল্লেখ্য আমার সেল ফোনটা বন্ধ করে রেখেছিলাম আড্ডার সময়) কি আর করা, হাজার হোক বাবার ডাক। তাই গল্পে ভঙ্গ দিয়ে বাড়ী ফিরলাম। এই বয়সেও বাবার চোখ রাঙ্গানো মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে, তবুও কি করি, বাবাতো বাবাই, যিনি জন্ম দিয়ে জীবনের তিন চার দশক ধরে চোখে চখে রেখে এখনো খোকার মতো আদর করেন তাঁর কথা কি না মেনে চলা যায় ? জানি রায়দার বাসায় প্রতিদিন বিকালে আড্ডা বসে। তাই মনে মনে ভাবলাম কালকে আবার হাজির হবো। এই কথা ভাবতে ভাবতে যে বাহির হবো তখন রায়দা বললেন আলোচনাটা আগামী কাল শেষ করবো। আমিও বললাম তাই হবে।

বাড়ী ফেরার পথের মাঝখানে মা ফোন করলো। কোথায় তুই, তোর বাবা এখনো বাড়ী ফিরেনি, ওর বাড়ী ফেরার আগে যেন বাড়ী এসে হাজির হস। আমি বললাম আমি পথে, এখুনি ফিরছি। দেখলাম ছোট ভাই তার মোটর একটা দোকানের সামনে দাড় করালো। আমি ও পিছে দাড়ালাম। দুধ কিনবে। টুক টাক বাজার করে বাড়ী ফিরলাম। দেখি বাবা বাড়ীতে হাজির। বকা খেলাম হাল্কা একটা। কে এত্ত তোয়াক্কা করে, এই লোকটা তো আমাকে হামেশাই বকে, আবার বন্ধুত্বের সময় পুরোদমে বন্ধু। তো এত ভয় কিসের ! তারপর বাবাকে বললাম রায়দার বাসায় গিয়েছিলাম। বাবা বলে আমি আফজাল কাকার সাথে কথা বলেছি। উনি আমাদের এখানে আসছেন রায় সহ। আমি বললাম কাজটা কি ভালো করলেন ? কারণ কোথায় বাবা ছেলে বসে একটু আলাপ করবো, তা না করে, বাবা বললেন আজকে রাতে কিছু মানুষ আসবে আমাদের বাড়ীতে। আমি আগা মাথা কিছুই বুঝতে না পেরে কিছুই বলিনা। তো সেই রাতে আমরা সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দিলাম। দুরের যারা তারা কেউ কেউ থেকে গেলো কেউ চলে গেলো। কারণ ছিল শুক্রবার রাত। টানা দুইদিনের বন্ধ। তারপর আরও একদিন গেলো। মনটা কোনো রকমে মানছেনা। রায়দার বাসার আড্ডায় আর যাওয়া হলো না। হঠাৎ মনে হলো আমি আর লিখবো না। কথাটা কাকে বলা যায় ভাবছি। অনেক ভেবে, চিন্তা করে ঠিক করলাম বাবাকেই বলবো। যেই বলা অমনি বিরাট এক ধমক। বকতে বকতে বললেন না তুই লেখা থামাবি না। তোর লিখতে হবে। তোর দিকে আমরা চেয়ে আছি লক্ষ মানুষ কোটি মানুষ। তুইইতো বলিস পৃথিবীতে এখনো অনেক ভালো মানুষ আছে, তাই এই পৃথিবী এখনো গতিশীল। নয়তো থেমে থাকতো, ঝুলে থাকতো কোনো এক সীমানায়, কোনো এক গন্ডিতে। বাবার গলাটা কখনো ধরা গলা আমি আমার জীবনে শুনি নাই। আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা বাবার বিয়ে দিয়েছিলেন কচি বয়সে, আমার জন্মের পর থেকে আমিই যেন বাবার সব। বিবেকে নাড়া দিলো। নিজেকে নিজে বলছি, এই দিগন্ত তুই লিখে যা , তোর পুরো জীবনের দেখা সব ঘটনা গুলো তুই মানুষের কাছে তুলে ধর। কেউ তোকে বিব্রত করবে, কেউ উদ্ভট যুক্তি নিয়ে হাজির হবে, তা দেখে নিজেকে থামিয়ে রাখা যায় না।

এর মাঝে কয়দিন গেল। এবার কাজের ফাঁকে আবারো সময় খুজছি । রায়দার বাসার আড্ডায় যাবার জন্য। পরেরদিন সময় পেলাম। এবার বাবাকে বলে গেলাম, আমার বাড়ী ফিরতে রাত হতে পারে। ওই সেই একি মানুষ তার সাথে দু একটি নতুন মুখ তো থাকেই হর হামেশা। কাউকে চিনি, কাউকে চিনিনা, আবার কাউকে মুখ চেনা চিনি। নতুনদের সাথে পরিচিত হয়ে আমি নিজেই বললাম দাদুকে আমার আলোচনার বাকীটা আজকে শেষ করতে চাই। কেউ কেউ উৎসাহী হয়ে বললো কোন কথা। সেদিন আফজাল দাদুও ছিলেন রায়দার বাসায়। দাদু বললেন ঠিক আছে, তবে আজকে আমরা একই বিষয়ে বেশী

আলোচনা করবো না, তবে নতুন কিছু নিয়ে বলবো। রায়দা বললেন লেখককে লিখতে দাও। আমরা আলোচনা করে কোনো সমাধানে আসতে পারবো না। যেইই নিরীহ মানুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লিখবে তার প্রতি আমাদের সম্পুর্ন সমর্থন থাকবে। দাদু বললেন আজকের এই পরিবেশে আমাদের সবার সোচ্চার হওয়া উচিৎ। পর্দার আড়ালে আর কতো কাল লুকিয়ে থাকবো? আর কত কাল লুকিয়ে থাকতে দেবো ? এবার আমারও আর এই বিষয়ে আলোচনা করার মন চলে গেলো। রায়দা মুচকি হেসে বললো চাঁদ, সূর্য্য , আলো বাতাস সবই সত্যি। আজকের দিনে যে বৈজ্ঞানীক যন্ত্র পাতি ব্যবহার করছি তা সবই সত্যি। আমরা আধুনিক যুগের মানুষ, পেছনে ফিরে তাকানোর সময় আমাদের আর নাই। এই নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব। যারা থেমে থাকবে তারা আমাদের অনেক পেছনে পড়ে যাবে। আমেরিকা কখনো বাংলাদেশ নয়, আরব কখনো ইউরোপ নয়, জাপান কখনো ভারত নয়। প্রতিটা স্তম্ভের একটা সাতন্ত্র্য বৈশিস্ট আছে। এ ধ্রুব সত্য। রায়দা এবার আমাকে বললো তুমি কি বলো? আমি বললাম আমি যদি এই কথাটা বলি। যে..

ঢাকা লেখার জন্য শেষ শব্দটা কা টাকা লেখার জন্য ও শেষে একটা কা লাগে। রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি লিখতে গেলেও শেষে একটা নীতি নামক লেজ লাগাতে হয়। কিন্ত সব নীতি ও সব কা এক নয়। ভারতের গোধরা যেমন একটি অঞ্চল তেমন বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও একটি অঞ্চল। সব সম্প্রদায় যেমন এক নয় তেমন এক সম্প্রদায় ও সব নয়। তাইতো আমি নিজের ভাষায় বলতে এলে কেউকে যোশ ওয়ালা এছালামী জন্ত বলি আবার অপর দিকে নিরীহ সংখ্যালঘু বলি। তাই কেউ যোশ ওয়ালা সাম্প্রদায়ীক আবার কেউ নিরীহ সাম্প্রদায়ীক হয়।

দাদুর কথা, কর্ম মানুষকে গিলে খায়, মানুষ কর্মের দাসে পরিনত হয়। সৎ কাজে সৎ গতি নিশ্চিত। এই আমি বাবা ছেলে যোয়ান বুড়ো সবার আফজাল দাদু একদিনে হইনাই। হয়তো এই আমি কোনো দিন এই সব মানুষ গুলোকে ভালোবাসা দিয়েছিলাম তাই তারা তার প্রতিদানে শ্রদ্ধা দেয় , ভালোবাসা দেয়, যেখানে রাত সেখানে কাৎ হয়ে থাকি মানুষের ভালোবাসা নিয়ে। এই ৪২ বছরের পরবাস জীবনে পরম সুখি । মৃত্যুর জন্য দুঃখ হয়, কামনা করি আবার যেন মানুষ হয়ে ফিরে আসি এই পৃথিবীতে, আবার যেন মানুষের কাঁধে কাধ মিলিয়ে গণ মানুষের ভীরে মিশে যেতে পারি।

আড্ডায় গিয়েছি আবারও কয়েকদিন হয়ে গেলো। আর কতদিন নিজের বন্ধু বান্ধবদের কাছে লুকিয়ে থেকে লিখব? এবার আমার আফজাল দাদু জানবেন। রহমান জানবে। নমিতা ,পিটার সবাই জানবে সেই দিনের আড্ডার। এবার আমি তাদের হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি হবো। হয়তো অনেক নতুন তথ্য পাবো, হয়তো ভালো কিছু বেরিয়ে আসবে। কিছু যদি খারাপও হয় তবুও কি থেমে থাকা যায় ।

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখি হোক। সবাই শান্তিতে থাকুক।

সবাইকে ধন্যবাদ।
৩০/০৯/২০০৩